Ethics and Economics

Geeta rani Das
Bea member no. 929

"Ethics and economics" এর মধ্যে কোন সাংঘর্ষিক সম্পর্ক নেই। বরং একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অনৈতিক ব্যবহার শুধু সমাজে নয় সর্বত্র ধ্বংস আনতে বাধ্য। তাই অর্থনৈতিক উপকরনসমূহ কর্মক্ষম রাখতে প্রয়োজন অনৈতিক নীতিমালা দিয়ে এগুলোকে কলুষিত না করা। নৈতিক কার্যক্রমের জন্য একজন মানুষ পূণ্য অর্জন করে যা' তার মূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। সম্পদ, সুনাম ,ভালোবাসা স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে মানুষের মূল্য বিচার্য। Ethics হলো principles of morality. এই একটি জিনিষের অভাবই মূলত: শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর জাতি সমূহের সম্পদের অপচয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রীতার কারণ।

অর্থনীতিবিদরা যখন পুঁজিবাদ, লাভক্ষতি, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি ধারণা নিয়ে ব্যস্ত তখন নীতিবানরা ভালো, উত্তম প্রিয়পাত্র হতে চেষ্টা করে। তাইমূল্য অর্জন করা উত্তম এবং মূল্যবান লোককে অনুসরণ করা যৌক্তিক। যত বিভেদই থাকুক , ethical issues গভীর ভাবে সম্পৃক্ত অর্থনীতি, যশ, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়াাদির সাথে। accountability, দৃষ্টিভংগী, চিন্তা চেতনায় যে যত স্বচ্ছ সে তত মূল্যবান জিনিসকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। যেহেতু ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ এবং সমাজকে নিয়ে দেশ ও পৃথিবী তাই অথৃনীতির নৈতিক উপকরণ সমূহকে সচল রাখার মাধ্যমে কিভাবে সমাজে নিজের অবস্থান ও মূল্য উন্নত করা যায অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কিভাবে নিজের অর্জিত সম্পদ নিজের ভোগ ব্যয়ে নি:শেষিত না করে অপরের জন্য কিয়দাংশ হলেও ত্যাগ করে। স্বয়ংক্রিয় উপায়ে যা সকল

মানুষের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়না বিধায় সরকারের নীতিমালার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। তবে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বা সত্যিকারে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা প্রদর্শন অধিকতর কাম্য ও যৌক্তিক। তাই ত্যাগকৃত অর্থ যেন কোন ভাবেই অনৈতিক কাজে ব্যয়িত না হয় সেই বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। একজন সৎ, আর্থিকভাবে পংগু ব্যক্তিকে সাহায্য করা আর একজন উচ্চৃঙ্খল, সন্ত্রাসী, নেশায় বুদ হয়ে থাকা অলস ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করা এক হতে পারে? যেমন এক ব্যক্তি তার অর্জিত সম্পদের অর্ধেক তার নিজ সংসার অর্থাৎ স্ত্রী সন্তান ও নিজের জন্য ব্যয় ছাড়াও বাকী অর্ধেক এর বাইরে খরচ করতো যে বিষয়ে কোন জবাবদিহিতা থাকতোণা। তার লাইন বিচ্যুতির কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও লাইনচ্যুত হতে হয়। ফলে প্রতিযোগীতা মূলক ভাবে অর্থ সম্পদ ছড়ানো ছিটানোর কারণে সম্পদের অপচয়ে পরিবারটির কাংখিত সাফল্য মুখ থুবড়ে পড়ে। এ বিষয়টিতেও সরকারের স্বচ্ছ নীতিমালার প্রয়োজন অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিটির আয় ব্যয়ের উৎস, আয়কর প্রদান ছাড়াও কত% "করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি " তেব্যয় করবে তার উপর। একটি পরিবারের জন্য % হারের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বাইনারী পদ্ধতি যেমন: ০১০১০১ অর্থাৎ স্বামীর্ পক্ষের লোকের জন্য ১ টাকা ব্যয় হবে তো স্ত্রীর পক্ষের লোকের জন্য এক টাকা ব্যয়। এটা হলো পরিবার ভিত্তিক CSR কৃত অর্থের নৈতিক বন্টন ব্যবস্থা ।

যদিও নৈতিকতার বৈশ্বিক সংজ্ঞা থাকলেও দেমে বিদেশে এর প্রায়োগিক সংজ্ঞা ভিন্ন রকমের। যেমন: একটি দেশে মদ উৎপাদন ও ভক্ষন হারাম আবার অন্য দেশে তা' সেবন অত্যাবশ্যক হতে পারে। তা্ই নৈতিকতার সংজ্ঞা ও প্রয়োগ সব বিষয়ে সকল দেশে অভিন্ন হতে পারেনা। আবার একটি দেশের বা জাতি গোষ্ঠীর জন্য মদ গাঁজা নিষিদ্ধ হলেও দক্ষ শ্রম শক্তির কারণে সে সকল দেশে মদ এর উৎপাদন খরচ কম হতে পারে এবং উৎপাদিত পণ্য দেশে ভোগ না হয়ে বিদেশে রপ্তানী করা যেতে পারে। এখানেও নৈতিকতার বিষযটি একটু ভিন্ন আংগিকের। অর্থাৎ রয়েছে বেকারত্ব দূরীকরণ ও উৎপাদন খরচ কমানোর নৈতিক দিক। একজন মহিলা যিনি ৪০ বছর বয়সে ১০ লাখ টাকার মালিক এবং অবসরজীবণে ঘুরে বেড়িয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। অপরদিকে অন্য একজন মহিলা যিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে ১০ লাথ টাকার মালিক যখন তার বয়স ৪০। উক্ত অর্থ থেকে তিনি চ্যারিটিতে দান কররেন ৯.৯ অ তাহলে কে সকলের কাছে প্রশংসনীয় । অবশ্যই ২য় জন ।

জন্মগতভাবে মান্রষের চরিত্র, আকার, অভ্যাস , শিক্ষা, ও সাংস্কৃতিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন। খাদ্য দ্রব্য গ্রহনের পরিমান ও ভিন্ন ভিন্ন। আবার পরিবেশগত ওকালচারাল ভিন্নতার কারনে ওদেখা যায় ব্যবহারিক প্রয়োগের ভিন্নতা। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় বিদ্যমান পরিবেশগত, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রতিযোগীতা করার সক্ষমতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ভূগর্ভস্থ সম্পদের প্রাচুর্যতা/ দুস্প্রাপ্যতা সহজলভ্যতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ethical অর্থনীতি গড়া অধিকতর গ্রহনযোগ্য। তবে তিনটি মৌলিক বিঘয় পৃথিবীর সকর দেশে ও সকল ধরনের কর্মকান্ডে গ্রহনযোগ্য তা হলো :- ভালোবাসা , স্বাধীনতা ও সম্পদ। এই ত্রয়ের চাহিদা বিশ্বব্যাপী সমান।

নৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দিকটি ও মূখ্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার এর গঠনপ্রকৃতি, ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক আদর্ম/অন্যান্য দলের পার্টি মেনিফেস্টো ইত্যাদি বিষযাদিও একটি দেশের অর্থনীতিকে Ethical standard এ উন্নীত করতে সমভাবে কার্যকর। রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার নীতি নির্ধারক মহলের বিবেচনায় যে বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উপযুক্ত মনে হবে তাই হবে দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা। যেমন : মুদ্রানীতি প্রণয়ন, বাজেটের মাধ্যমে সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা নিরুপন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়নত্রণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পে সম্পর্কোন্নয়ন, করারোপ, আর্থিক নীতি প্রনয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা।

অবশ্যই কোন বিশেষ এলাকার অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গিয়ে " দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হচ্ছে কিণা? (২) যে সব মেধা, প্রতিভার বিকাশে সমাজ আলোকিত তাদের যথার্থ মূল্যাযন হচ্ছে কিনা? ভালো ও মন্দের Ļশ্বরিক বিচার সময় সাপেক্ষ বিধায় প্রতিটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিরুপন, নিরীক্ষণ, ঘটনার নিয়মতান্ত্রিকতা যাচাইকরণ এসবই নৈতিক অর্থ নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের উপকরণ।

নৈতিক ইস্যগুলি অত্যন্ত গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত অর্থনৈতিক ইস্যুর সংগে। প্রতিটি কর্মকান্ড আইন দ্বারা আবরিত কিনা? এবং প্রনীত আইনগুলিও নৈতিকতা পূর্ণ কিনা? প্রতিটি দেশেরঅর্থনৈতিক চাকা ঘুরছে স্ব স্ব দেশের জাতীয় নীতিমালার হুইলে। নীতিনির্ধারকগণ স্রষ্টা বা অতিমানব কোনটিই নয়। তাই তাদের রাজনৈতিক দর্শন ও দেশপ্রেমিক মানব সম্পদের জন্য কল্যাণকর কিনা বিবেচ্য বিষয়। –Harmonial atmosphere এবং Domestic violence নিরসণের জন্য অবশ্যই তাদের কর্মকান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও অদ্যাবধি অর্থনীতিকে বিভিন্ন সময়ের অর্থনীতিবিদগন বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যা বর্তমান সমাজে সম্পূর্ণ ভাবে ত্রুটি মুক্ত নয়। যেমন : অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতিকে নীতিবাচক বিজ্ঞানে এবং অধ্যাপক এল রবিনস অর্থনীতিকে একটি ইতিবাচকবিশুদ্ধ ও সার্বজ নীন বিঞ্জানে পরিণত করেছেন। সর্বত্রই মানুষের কল্যাণের কথা প্রাধান্য পেয়েছে তা যে ভাবেই হোক। এতে ব্যবস্থাপনার দিকটি উঠে এসেছে। সমাজে কুকর্মে সম্পৃক্ত করা যায় এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম কারণ তাদের কর্মকান্ড স্বচ্ছ না থাকায় আকস্মিক বিপর্যয় এড়ানো যায়না। অপরদিকে ভালো কাজ করার মতো লোকের সংখ্যা অদিক হলেও উগ্রবাদিতা না থাকার কারনে তারা পরিস্থিতির স্বীকার। উপরন্তু রয়েছে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, আদর্শগত বিভেদ। এসব কিছুকে " সমন্বয় ও জবাবদিহিমূলক" অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বজনীন ভাবে গড়ে তোলাই শ্রেয় : অনেকে যেমন কল্যান রাষ্ট্রের ধারনার সাথে নৈতিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এক করতে চেয়েছেন মূলত: তা নয় । মুক্ত অর্থনীতির পূর্ণ প্রতিযোগীতায়, পুঁজিবাদের উপস্তিতি, কোনটির সাথেই নৈতিকতার সংঘর্ষ নেই। এখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানোন্নয়ন, মোটামুটি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ পরিবেশের ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা ভাজন, কর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে বলা যায় নৈতিকতা পূর্ণ অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই নৈতিকতা সংরীিত হতে পারে মিশ্র অর্থব্যবস্থায়ও। শুধুমাত্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়ই যে নৈতিকতা সংরক্ষিত হবে এমন কোন কথা নেই। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সত্যিকারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বাদে সমাজে সকল ব্যক্তিকে যদি আয় করের আওতায় আনা যায় তবে সি এস আর এর প্রয়োজন **ক্ষীণ হয়ে আসা উচিত**। আয়ের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহিতা নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কে ত্বরান্বিত করতে পারে। অর্থ অপচয় ও ভোগ ব্যয়েও থাকতে পারে ব্যাপক ব্যবধান। যার তুলনামূলক পর্যালোচনার সুযোগ কম। সমাজে সি এস আর এ সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও অত্যন্ত সীমিত। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বা সরকার প্রণীত আইনসিদ্ধ নীতিমালা দিয়েই তৈরী হওয়া উচিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। যা হওয়া উচিত আরো বেশী বিশ্লেষাত্মক। অনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনাকারী টার্গেট গ্রুপ বা সিন্ডিকেটেড গোষ্ঠীর কর্মকান্ডকে প্রতিহত করা না গেলে তথ্যের গোপনীয়তায় অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থনীতি বিদ পিগু এর মতে মানব কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে অর্থনীতি নীতি শাসেত্রর ভৃত্যস্বরূপ। নৈতিক অর্থনীতি কখনোই অকল্যাণকর কর্ম উদ্দীপণা সংশ্লিষ্ট নয় ।

অন্যান্ত্র বিজ্ঞানের মতো অর্থনীতিতেও কতকগুলো মৌলিক ধারণার রয়েছে। যেমন : ১

দ্রব্য : যা 'বস্তুগত ও অবস্তুগত (যেমন : গায়কের গান ,কবি প্রতীভা ওব্যবসায়ী সুনাম)। এ ছাড়াও রয়েছে ভোগ্য দ্রব্য বা মূলধন দ্রব্য উত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য যা নীতিগতভাবে আইনসিদ্ধ সে সকল দ্রব্যই নৈতিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত।

ক) সম্পদ : সম্পত্তি ও মানব সম্পদ। সম্পদ চারটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত। যেমন উপযোগ, অপ্রাচুর্য, হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা। তবে সৎ উপায়ে অর্জিত এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ সম্পদই হলো নৈতিক সম্পদ। সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ মানুষেরকল্যান করাই হচ্ছে চুড়ান্ত লক্ষ্য যদি কিনা তা যথাযথভাবে ব্যয়িত হয়। সম্পদ কল্যানের উৎস। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কল্যান বৃদ্ধি পাবে কিনা তা সম্পদের উৎপাদন বন্টন ও ভোগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একটি দেশের অথৃনীতিকে আরো বেশী নৈতিক

করতে কি কিধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে তা মূলত: সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের আওতাভুক্ত। যে দেশে সরকার ব্যবস্থা নেই সেখানে স্বয়ংক্রিংভাবে ঘটনা পরম্পরায় নৈতিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। যা সময ও অর্থের অপচয় বৈ আর কিছু নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত যেমন: পুঁজিবাদ, সমাজতনত্র, সাম্যবাদ, মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। কোন কোন দেশে একটি বিশেষ ব্যবস্তা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। আবার কোথাও কোথাও মিশ্র ব্যবস্তাকেনিদ্রক অর্থনর্তি গড়ে উঠতে পারে। তবে যেই ব্যবস্তাই থাকুক না কেন উৎপাদন ও ভোগকার্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সরকারী নিয়নত্রন ব্যবস্থার সংমিশ্রন নৈতিক হওয়া উচিত। যেমন: আমাদের মতো দ্বিধাবিভক্ত জাতির জন্য মিশ্র অর্থব্যবস্থাই অধিকতর নীতি সিদ্ব। যদিও এত করে অন্তর্কোন্দলবৃদ্বি পায়। তবুও প্রতিযোগীতা বিদ্যমান থাকায় লোকে পরিশ্রমী হয় এবং মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

একটি স্বাধীন দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি মূলত: উৎপাদন। কোন নির্দিষ্ট সময় একটি দেশে দেশীয় উপকরন ব্যবহার করে কি পরিমান বস্তুগত ও অবস্তুগত পন্য উৎপন্ন হয় তার মোট মূল্য হলো একটি দেশের মোট জাতীয উৎপাদন। উক্ত পণ্য নৈতিকতা পূর্ণ বা ইথিক্যাল কিনা তা নির্ভর করে উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন উপকরণের নৈতিক ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তারউপর। তাই উৎপাদনের চারটি উপকরনের কার্যাবলী বিশ্লেষনেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসে।

১. ভূমি :

ভূমি ব্যবহারে নৈতিকতা প্রদর্শন অত্যন্ত জরূরী। এতে মাতৃভূমির সুনাম ছাড়াও ভূমি ব্যবহারে সনত্রাসীদের লীলা ক্ষেত্র রূপে ভূমির ব্যবহার করা যাবেনা । এছাড়াওএমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, কীট নাশক ব্যবহার করা যাবেনা বা এমন কিছু শিল্প কলকারখানা স্থাপন করা যাবেনা যাতে করে আবহাওয়া ও জলবায়ূ দুষণের কারণে মাটির উর্বরতা বিনষ্ট হয়ে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পরিকল্পিত ভাবে বনজ সম্পদ সংরক্ষন অত্যন্ত জরুরী। কারণ তীব্র দাবাদহের কারণে অনেক স্থানে আগুণে ভস্মীভূত হতে দেখা যায়। এটাও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রতি ঘনফুটে জনবসতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। যেসব কলকারখানার বর্জ্য পদার্থে নদ নদীর পাণি দুষন হয়ে থাকে এলাকাবাসী দুর্বিষহ জীবন যাপনে অতীষ্ট হয়ে ওঠে সে সব বিষযাদি নৈতিক নীতি নির্ধারক মহলের/অর্থনীতিবিদদের চিন্তায় ও মননশীলতায় প্রধান্য পাওয়া উচিত। কত পরিমান জমি কৃষি খাত,কতটা আবাসভূমির জন্যব্যবহার কতটা শিল্পে ব্যবহার, কতটা বানিজ্য ও যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত তা সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত। কতটা জমি সরকারী খাতে কতটা বেসরকারী খাতে থাকবে তারও রূপকল্প তৈরী থাকা উচিত।

২. শ্রম : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের শ্রম ,মেধার যৌক্তিক ব্যবহারে র্ভমি এবং মূলধনকে উৎপাদন কাজে লাগানো যায়। মানুষের মেধা যদি মানুষের মংগলার্থে কাজে লাগানো না যায় তবে সেই মেধার কোন মূল্য নেই। আবার শ্রমিক যদি শ্রমের যথাযথ মূল্য না পায় . প্রকৃত আযকে বিবেচনায় আনা না যায়এবং বীমা সুবিধাসহ অনান্য সুযোগ সুবিধা ও কাজের পরিবেশ বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায় তবে অবশ্যই শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তা ' প্রতিকুল ।এছাড়াও দরকষাকষির এজেন্ট হিসাবে ক্ষমত্া প্রদান তন্মধ্যে অন্যতম। যে সব শ্রমিক দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করে এবং যাদের কোন

উৎসব ভাতাপ্রদানের বিধান নাই তাদের মজুরীও অন্যন্যদের তুলনায় বেশী হওয়া বাঞ্চনীয়। কাজের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী ও শ্রম নির্ধারিত হওয়া উচিত। যে সব সৃজনশীল বুদ্ধি মানব কল্যাণে ও নতুন নতু ন আবিষ্কারে সম্পৃক্ত সে সকল শ্রম অধিক মূল্য পাওয়ার যোগ্য। তীব্র দাবদাহে কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরী আর এয়ার কন্ডিশনে বসে কাজে রত শ্রমিকের মজুরী কি এক হওয়া বাঞ্চনীয় নাকি নৈতিক। আবার হাত পাখার বাতাসে মন জুড়ানো গেলেও দীর্ঘক্ষন চালানো কষ্টসাধ্য। তৎকালীন সময়ে মির্জ্জা সাহেবরা বা জমিদাররা সেই পারিশ্রমিক দিয়েছিলো কি? মার হাতের রান্না খেয়ে সোনামনির স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা চালানো ছাত্রের বেতন কাঠামো আর কাজের লোকের হাতে অথবা একা একা রান্না করে খেয়ে না খেয়ে পড়াশুনা করেছে তার বেতনের সমতুল্য হতে পারে? এখানেও বিভাজন প্রয়োজন। বিশ্লেষণ একেবারে ক্ষুদ্র না হলেও মাঝারী ও নাগালের মধ্যে থাকা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

৩. মূলধন : মানুষের উৎপাদিত সম্পদ। যা বর্তমানে মানুষেরভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলধন সাধারণত: অধিকতর উপার্জনে ব্যবহৃত হয়। শ্রমিকের কায়িক শ্রম লাঘবের জন্য যনত্রপাতির ব্যবহার এবং শ্রমিকের মোট উৎপাদনের কত পরিমান মূলধন গঠনের কাজে ব্যবহৃত হবে তা' নির্ধারণ এবং উৎপাদন না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদনজনিত খরচাদি মিটানোর জন্যও মূলধন প্রয়োজন। সরকারীহোক আর বেসরকারী খাত হোক উভয় ক্ষেত্রেই মূলধনের প্রয়োজন। সরকারী কর ব্যবস্থা, ঘাটতি বাজেট, বিদেশী বিনিয়োগ,আভ্যন্তরীন সঞ্চয়, মুদ্রানীতি, সুদের হার, শেয়ার ব্যবসা, সরকারী বিল বন্ড ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠণ উল্লেখ্য। উন্নত দেশসমূহে মূলধন গঠনে নিয়মনীতি পরিপালিত হলেও অনুন্নত দেশে তা হয়ে থাকেনা কারণ মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, নিরাপত্তার অভাব, জনগণের দুরদৃষ্টির অভাব, বাজারের সীমাবদ্ধতা, পণ্যের গুণগত মান ও বাজারের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ উদ্যোক্তারঅভাব, সম্পদ বন্টনে অনৈতিকতা,রাষ্ট্রীয নীতিমালা, ব্যংক সুদের হার ইত্যাদি। কস্ট বেনিফিট হিসাব করে সরকারী ও বেসরকারী খাতে ঠিক কতো পরিমান মুলধন গঠনে ব্যয় করা উচিত তা নির্ধারণ করা যৌক্তিক। আভ্যন্তরীন মূলধন গঠন কাম্য পর্যায়ে না থাকায় যৌথ মূলধনী কারবারের ধারণা অধিকতর গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠেছে বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনীতির জন্য। তবে উক্ত মূলধণ সংগ্রহ ও ব্যবহার কতটা নৈতিক তা ' বিচার বিশ্লেষণ করা উদ্যোক্তা ও সরকারের কাজ। ব্যবহৃত মূলধন দীর্ঘ মেয়াদে লাভ আনবে নাকি স্বল্পমেয়াদে লাভ আনবে তার কস্ট বেনিফিট হিসাব করা অত্যাবশ্যক।

৪. সংগঠন: কি ধরণের প্রতিষ্ঠান একটি দেশের জন্য কাম্য বা নৈতিকতাপূর্ন তা ' বিবেচনার দায়িত্ব উদ্যোক্তার। উৎপাদনের সকল উপকরনগুলিকে পরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ ভাবে পরিচালনারদায়িত্ব সরকার বা উদ্যোক্তার। ব্যাপক অর্থে সরকার ও একজন উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা নিজেই নির্ধারণ করবে কি কি ধরণের প্রাতি্ষ্ঠানিক কাঠামো কোন কোন ধরনের ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। যেখানে শুধু লাভ ক্ষতির হিসাব অনেক সময় প্রাধান্য পাবেনা বরং অস্তিত্বের বিষয়টিও প্রাধান্য পাবে। প্রতিষ্ঠানটি এক মালিকানা, অংশীদারী, যৌথ মালিকানা, সমবায় নাকি সম্পূর্ণভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হলে নৈতিকতা বজায় রাখা যায়তার দায়িত্ব সরকারের নীতিণির্ধারক মহলের। তবে সরকার পরিচালনায় নিযুক্ত রাজনৈতিক দলের আদর্শ যর্দি স্বৈরাচারী হয় তবে সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিও স্বৈরাচারে পরিনত হয়। তথ্যের গোপনীয়তার মাধ্যমে হিসাববিহীন অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে জনদুর্ভোগ বাড়িযে তোলে। বিপরীত অবস্থায় মুক্ত মনের বিকাশ ঘটে

,বিচারব্যবস্থা নৈতিক হয় এবং সরকারের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় সাধারন মানুষের আস্থা ফিরে আসে। শ্রম ও মূলধন অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। অবাধ বানিজ্য নীতির মতো পরিবেশ সৃষ্টির ফলে সুবিধা অনুযায়ী সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিরাজ করে। শ্রমের গতিশীলতায় উৎপাদন বৃদ্বি পেয়ে অর্থনীতির চাকা সচল হয়। সরকার যদি স্বৈরাচারী বা সমাজতানিত্রক আদর্শপুষ্ট হয় তবে ব্যবসা সংগঠন গুলো অংশীদারী, সমবায় ভিত্তিক বা যৌথ মূলধনী কারবার হওয়া উচিত। সরকার যদি গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত হয়তবে একচেটিয়া কারবার সহ উল্লিখিত বিভিন্ন সংগঠন ব্যবসাপরিচালনা করতে পারে। অবশ্যই সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠন গুলোর মতবিনিময়ে ইথিক্যাল ব্যবসার নিয়মনীতি নির্ধারিত হবে ।

৫. বাজার ব্যবস্থা: অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায়না বরং এক বা একাধিক পন্যকেবুঝায় যা ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগীতার মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় হয়। উন্নত ও অনুন্নত দেশের বাজার ব্যবস্থা এক রকম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন না ও হতে পারে। এ্টা নির্ভর করে ক্রেতাগনের শিক্ষা সচেতনতা, দেশাত্মবোধ, বিক্রেতাদের নৈতিকতা, মূলধনের উৎস সরকারী নীতিমালা ইত্যাদি বিষযাদির উপর। সর্বোপরি সরকারের পর্যবেক্ষণ, নিয়নত্রন ও মুখ্য বিষয। এজন্য আইন দ্বারা বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগীদের ক্ষমতা সংরক্ষন করা যেতে না পারে। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অথচ সম্পদশালী দেশের জন্য " নিয়নিত্রত প্রতিযোগীতা " মূলক ব্যবস্তা অধিকতর কাম্য। আমদানী রপ্তানী বানিজ্যে শুল্ক ট্যাক্স ইত্যাদিরমাধ্যমে নিয়নত্রন বজায় রাখা। দেশীয় উৎপাদন এর তুলনায় আমদানীকৃত পন্যের মূল্য কম হওয়া সত্বেও বেকার সমস্যা দূরকরনে দেশীয় শিল্পকে প্রণোদনা প্রদান অধিকতর নৈতিক বলে বিবেচ্য হতে পারে। মানুষের সাথে মানুষের সমর্কোন্নয়নেই বাজার সম্প্রসারিত। অলিগোপলি ,ডুওপোলি একচেটিয়া বর্তমানে নেই বললেই চলে । কোন বিশেষ পন্যের জন্য একচেটিয়া বাজার থাকতে পারে আবার কতিপয় পণ্যেরজন্য "অলি" ও "ডুও" থাকতে পারে। পাশাপাশি সরকার নিয়নিত্রত একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থারও প্রচলন থাকতে পারে। মোটামুটি উভয় সংকটে থাকা দেশের জন্য মিশ্র বাজার ব্যবস্থা অধিকতর নৈতিকতাপূর্ণ।

৬. সরকারী : সরকারী, পৃষ্ঠপোষকতায় সকল অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনা নিয়নত্রন, বাজার সম্প্রসারণ, মূল্য স্থিতিস্থাপকতা বজায় রেখে অর্থনীতির চাকাকে দীর্ঘস্তায়ীভাবে সচল রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য। যেহেতু সকল কিছুই সরকারী নিয়নত্রনে পরিচালিত তাই সরকারের কর্মকান্ড যদি অর্থ অপচয়কারী না হয় এবং নৈতিক বিবেচনায় পরিশুদ্ধ হয় তবে রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা বানিজ্য সকল ক্ষেত্রে স্বচ্চতা আনয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রযনেত্রর নিয়ন্ত্রনকারী হিসাবে সকল কর্মকান্ডেই সরকারের হস্তক্ষেপ আইনসিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় আদশ বাস্তবায়ন ও মানব কল্যাণই যখন সরকারের উদ্দেশ্য তাই রাষ্টের উচিত নৈতিক বিষযাদির নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করা। যে সব অসত্র গুলোকে নৈতিক অর্থনীতি গড়ার হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয় সেগুলি যেমন : আর্থিক নীতি, সরকারী বাজেট প্রনয়ন, মুদ্রানীতি, ব্যাংক হার নিরুপন, বানিজ্য হার, মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যাংক সুদের হার নির্ধারন, ক্ষতি নিয়ন্ত্রন, সরকারী ব্যয় নিরুপন, বানিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন, মানি মার্কেট ও মূলধন মার্কেটের জন্য নীতিমালা প্রনয়ন, করপাত ও করঘাত সংশোধন ইত্যাদি। সরকারের যদি সদিচ্ছা না থাকেতবে শুধুই অর্থের ও সম্পদের অপচয়। যেমন

:আমানতের সুদের হার নির্ধারনের ক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষনাত্মক হওয়া্। বাংলাদেশের পরিবেশ গত কারনে মহিলাদের গতিময়তা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ,ব্যবসা বানিজ্য করবার সক্ষমতা ও অনেকের নেই। তাই মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান অবশ্যই নৈতিকতাপূর্ণ। আবার ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত আমানতকারীদের ব্যাংক সুদের হার বেশী রাখা ইত্যাদি বিষযাদি। তাই বিভাজিত নীতিমালাই অধিকতর নৈতিক বলে বিবেচ্য। যাকে বলে Divide and cool আবার এক ব্যক্তি সারাজীবন কষ্ট করে অর্থাৎ ভোগ ব্যয় ন্যুনতম পর্যায়ে রেখে নিজস্ব মূলধন গঠন করলো্। অপরদিকে অন্যব্যক্তি অনুদান/ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অর্থের মাধ্যমে বাড়তি মূলধনের যোগান পেল। নৈতিক কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ক্রমবর্ধি জনসংখ্যা ও সীমাহীন অভাব মোচনের জন্য মোটামুটি ভাবে সকল ক্ষেত্রেই দুটি বিষয়কে প্রধান্য দেওয়া উচিত দ্রুততর সময়ে সমস্যা মোকাবেলার জন্য। যেমনঃ expenditure control এবং Innovation অর্থাৎ EC ও I। এর মাধ্যমে নৈতিক অর্থনীতি গড়তে অধিকাংশ লোককে হাঁটুর উপরে তুলে আনা সম্ভব। সর্বনিম্ন পর্যায়থেকে হাঁটুর উপরে এসে যারা বলবে "এই বেশ ভালো আছি "। ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়া কৃঞ্চুড়ার চাদরে হাঁটুর উপরে শুয়ে যারা প্রাণ খুলে গাইবে "তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার"। তবেই হবে নৈতিক অর্থনীতির স্বার্থকতা ও সরকারের সকল নিয়ন্ত্রনে নৈতিকতার ছোঁয়া। তাই সকল কর্মকান্ডকে আরো বিশ্লেষন ধর্মী করার জন্য কষ্ট বেনিফিটে % কমিয়ে বাইনারী পদ্বতি ০১০১০১০১ অধিকতর গ্রহনযোগ্য "Comprehensive Ethical standard" বজায়ে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্পের স্বপ্নপূরণ। প্রান্তিক, খেটে খাওয়া জনগোষ্ঠী যখন পরিতৃপ্ত, ন্যায়বিচার যখন প্রশ্ন বিদ্ধ নয়, মননশীলতা, মুক্ত মনের গতিবিধি যখন নিরাপদ, নির্ভরতা, আস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত তখনই বলাসমীচীন অর্থনীতি নৈতিক কাঠামোতে সাজানো। নৈতিক নীতিমালা একদিকে যেমন অপচয় রোধকারী অপরদিকে তেমনি সকলেরনিকট সমভাবে গ্রহনযোগ্য।

অর্থনৈতিক চক্র : অভাববোধ, কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিতৃপ্তি এই ত্রয়ী সমন্বয়ে ঘূর্ণায়মান অর্থনীতির চাকা। নৈতিক অর্থনীতির ব্যাখ্যায কোন ক্রমেই অনৈতিক কাজে লিপ্ত কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে অভাববোধ দূর করা কাম্য নয়। তাই দেখা যায় বহুজাতির দেশে এবং বহুত্ববাদে গনতান্ত্রিক কাঠামো ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা সর্বজনগ্রাহ্য। উক্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি নির্ধারক রা যদি গনতন্ত্র মনস্ক না হয়, তবে উক্ত বুনিয়াদে তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্র সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অপারগ। অনৈতিক কার্যকলাপ প্রসূত মেধা ও প্রকল্পে অর্থায়ন সামগ্রীকভাবে সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। একটি দেশের মেধাসম্পন্নতা ওতার কল্যানমুখী প্রয়োগই নৈতিক অর্থনৈতিক চক্রের মূল চালিকা শক্তি ।

জার্মান অর্থনীতিবিদ **Peter Koslowski** মতে, অধিকাংশ লোকের "সেল্ফ ইন্টারেস্ট" যদি যৌক্তিকভাবে মিটানো যায় তবেই তা নৈতিক অর্থনীতি। অর্থশাস্ত্রের জনক "অ্যাডাম স্মীথের " ওয়েলথ অব নেশনস উদ্ধৃত করে পিটার যুক্তি দেখায় যে ,রাজনৈতিক ওঅর্থনৈতিক সংযোগ এর সাথে দায়িত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং কো অর্ডিনেশন রয়েছে। তবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইথিক্যাল অর্থনীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজনৈতিক অর্থনীতি বাজার অর্থনীতির সামাজিক, আইনগত, প্রতিষ্ঠানিক গঠনপ্রনালী পরীক্ষা করে (মূল্য পদ্ধতি,

বাজার ইন্টারেকশান, চাহিদ্ ও যোগান, লাভ ক্ষতি,মালিকানা, চুক্তি,অধিকার ন্যায় বিচার) অন্যদিকে ইথিক্যাল অর্থনীতি এ সব প্রতিষ্ঠানের ন্যায়বিচারের নৈতিক নিয়মকানুন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষন করে ।

পিটার কোসলোস্কি ইথিক্যাল ইকোনমির গোড়াপত্তন করেন। ১৯৫২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত অর্থনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেছেন ।

কসলোস্কির বিশ্লেষন তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

১. অর্থনীতির নৈতিক পুর্ব অনুমানের তত্ত্ব
২. নৈতিকতার অর্থনৈতিক
৩. দ্রব্যাদির অর্থনৈতিক এবং নৈতিকতা এবং সংস্কৃতির গুণগত মূল্য ।

আজকে কেন আমরা ইথিক্যাল ইকোনমির কথা চিন্তা করি। কারন জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সেই তুলনায় কম। সীমিত সম্পদ কে সকলে মিলে মিতব্যয়ীতার সাথেব্যবহার করা না যায় এবং " অপাত্রে কন্যা দানের" মতো যত্র তত্র বন্টন করা হয় তবে তা' সম্পদের অপচয় বৈ আর কিছু নয়। নৈতিক অর্থনৈতিক নীতি মালা প্রনয়নের জন্য তিনটি প্রয়োজনীয় কারণ "কসলোস্কি " উল্লেখ করেছেন ।

১. গচেতনতা বৃদ্ধি করা : অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বর্ধিত্ত সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রতি সচেতন থাকা এবং তাদের নৈতিক জবাবদিহিতা প্রয়োজন ।
২. কৌশলগত অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের মানবিক বিষয়সমূহ এবং অর্থনৈতিক নেতাদের জবাবদিহিতার উচ্চাকাংখাপুন: আবিষ্কার করা ।
৩. গংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিশ্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা প্রতিহত করা প্রয়োজন ।

প্রকৃতপক্ষে কসলোস্কি ইথিক্যাল ইকোনমি কে ব্যাখ্যা করে আধুনিক উত্তর ইকোনোমি রূপে যা হবস, মেন্ডিভেলি, অ্যাডাম স্মিথ্ এবং মার্কস এর আদুনিকীকরণের অনুরূপ ।

Close juxtapose of economics and ethics enables to enjoy loving relationship and self-responsibility that enables to live in freedom by ethical economy.